Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : XIII Issue : VI, 15th, September, 2023 ১লা ভাদ্র, ১৪৩০, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সুকান্ত স্মরণে সংখ্যা।
সম্পাদকীয় লেখাটা লিখেছেন মৃণাল দত্ত।

কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমায়—চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

সুকান্ত ২০২৩

১৯২৬-১৯৪৭

মৃণাল দত্ত

১৯২৬-এ জন্ম নিল এক শিশু
তার বিস্মিত চোখে যেন
বাংলার নবজাগরণের বিদ্যুৎ
কিশোর বয়সেই তিনি দেখেছেন
নিরন্ন স্বদেশ, বিপ্লবীদের মহাসংগ্রাম
উদ্দীপিত কিশোর প্রতিজ্ঞ ভাষায়
লিখলেন সময়ের স্বরলিপি। তিনি
দেখলেন রাজপথে ক্ষুধার্ত অসহায়
মানুষের ফ্যান দাওয়ের কাতর কণ্ঠ
শীর্ণ মায়ের কোলে মৃতপ্রায় শিশুর
ক্ষুধার কান্না। সুকান্ত পথে নামলেন
সঙ্গে তার জোরালো প্রতিবাদী কণ্ঠে
বিদ্রোহের ভাষা,
আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথকে
আরেকবার জন্ম নাও কবি
গণসঙ্গীতের সুরে দাও উদ্দীপিত বাণী
আমরা জেগে উঠি
বিবর্ণ স্বদেশে মুক্তির গান গাই।

আকুপাংচার—যাত্রা হল শুরু

—মৃগেন গাঁতাইত

২৭ আগস্ট BIGRRC-র বেথুন ইনস্টিটিউট অফ আকুপাংচার উদ্বোধন হল। এটা মনে রাখার মতোন ঘটনা। সাম্রাজ্যবাদী জাপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মরণপন সংগ্রামে লিপ্ত চীনা জনগণকে সাহায্য করতে বেথুন চীনে গিয়েছিলেন। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে কৃষকদের বাড়িতে হাসপাতাল চালাতেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য ভারতের মেডিকেল মিশনের (১৯৩৮-১৯৪৩) ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিসকে ইয়েনান থেকে পাঠানো হয়েছিল। দুর্গম পথ পেরিয়ে সেখানে পৌছানোর আগেই ১৯৩৯ সালের ১২ নভেম্বর রক্তের জীবাণু আক্রমণে বেথুন মারা যান। কোটনিস পৌছে ঐ হাসপাতালের দায়িত্ব নেন। এই হাসপাতালেই পরে বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল নামে বর্তমানে হোপেই প্রদেশের রাজধানী শিচিয়াচুয়াঙ শহরে অবস্থিতি। কোটনিস ১৮৪২ সালের ৯ ডিসেম্বর চীনে মারা যান। মেডিকেল মিশনের অন্যতম সদস্য ডা. বিজয় কুমার বসু প্রায় পাঁচ

বছর থেকে সবার শেষে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে চীন থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ডা. বসু ১৯৫৮-৫৯ সালে চীন থেকে আকুপাংচার চিকিৎসা শিখে এসে কলকাতায় এই চিকিৎসা প্রবর্তন করেন। বেথুন, কোটনিস, বসু - তিন জনই চীনে সাধারণ মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, চীনের মুক্তিযুদ্ধেও অংশীদার হয়েছিলেন। আকুপাংচার চীনের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি যা কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষের উপকার করে আসছে। জনগণের চিকিৎসা বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই আকুপাংচার চিকিৎসা কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির মাধ্যমে ডাঃ বসু ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আকুপাংচারের মতন একটি গণমুখী চিকিৎসার সঙ্গে বেথুনের নাম যুক্ত হল বেথুন ইন্সটিটিউট অফ আকুপাংচার-এর মাধ্যমে। বেথুন বড় শল্য চিকিৎসক হয়েও বুঝতে পেরেছিলেন রোগের প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। মুনাফালোভী শাসকশ্রেণির প্রকোপে দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। তাই জনগণের শোষণবিরোধী আন্দোলন বা যুদ্ধে তিনি দেশে দেশে চিকিৎসার তরবারি তুলে নিয়েছিলেন। বর্তমানে আমাদের দেশেও স্বাস্থ্য সেবা পরিণত হয়েছে স্বাস্থ্য 'শিল্পে' (ইন্ডাস্ট্রি), যেখানে ইন্ডাস্ট্রির নিয়মেই লাভ-ক্ষতিটাই প্রধান বিবেচ্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আকুপাংচার চিকিৎসা অনেক বেশি গণমুখী - প্রকৃতি প্রদত্ত মানুষের রোগবিরোধী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বেথুনের আদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপুর্ণ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য — কিছু কথা

মৃণাল দত্ত

জন্ম ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৩, প্রয়াণ ২৯ বৈশাখ ১৩৫৪। কবি সুকান্ত তাঁর 'আগামী' কবিতায় লিখেছেন—

'আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।'

সুকান্ত মাত্রই ২১ বছর এ পৃথিবীর জল-মাটি-ঘাসে মগ্ন ছিলেন, ছিলেন কৃষাণের মজুরের শরিক। সুকান্তর মৃত্যুর কারণ দুঃসহ দারিদ্র্য, এ কারণেই দরিদ্র মানুষের সাথী হয়ে বলেছেন ঃ

'আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের
সারিতে প্রতীক্ষায়।'

মানুষের অসহায় ক্রন্দন, আর্ত চীৎকার সকলই খাদ্যের জন্য। এ সময়টা ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির

অসভ্য বর্বরতা। সুকান্ত এ বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছেন। অসহায় মানুষের পাশে থেকেছেন ক্ষুধাহীন পেটে। এমন নয় যে সুকান্তর আগে কেউ মানুষের দুঃখ বেদনা নিয়ে লেখেননি। রবীন্দ্র-নজরুল-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভাবিত বাংলা কবিতায় দুঃখ-দারিদ্র্য, মানুষের বাস্তব জীবন চিত্রিত হয়েছে। সুকান্ত তাকে মাটির কাছাকাছি এনেছেন। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতায় বলেছেন—

'আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।

. . .

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণসঙ্গীতের সুর;

সুকান্ত চেয়েছিলেন মানুষের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনে আসুক এক গণবিপ্লব, যাতে রবীন্দ্রনাথ হবেন সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, তবু তিনি নিজের অসম্পূর্ণতা আড়াল করেননি। নিজেই বলেছেন ঃ

'এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনে।
মর্মের বেদনা যতো করগো উদ্ধার
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা
চারিধার।
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরাপদ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও গো উদ্ধারি।'

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের হাত ধরে, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শেষ পাদে নজরুলের চিন্তার মধ্যে, সেই উত্তরাধিকার বহন করেছেন সুকান্ত ওই কিশোর বয়সে। তাঁর চিন্তা চেতনায় ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। সর্বোপরি ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজবাদী বিপ্লব। কিশোর বয়সে এই উত্তরাধিকার বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন গণসংগ্রামের মধ্যে। এই শীর্ণ কবির প্রতিবাদী ভাষাকে, একারণেই অধ্যাপক কবি বুদ্ধদেব বসু সুকান্তকে রাজপথে দেখে বলেছেন, 'কবিতাকে আর কত নিচে নামাবে?' সুকান্ত স্বভাবনম্র ভাষায় মাটির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এইখানে, রাস্তার মাঝখানে।' এবং সারাজীবন তাই তিনি করেছেন। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য সেই সময়ে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক। তিনি সুকান্তকে নিয়ে গেলেন স্বাধীনতা পত্রিকার দপ্তরে। তাঁর হাতে তুলে দিলেন কিশোর বাহিনীর দায়িত্ব। তাঁর সাংগঠনিক বোধ কিশোর বাহিনীকে করে তোলে সকল কিশোরের কাছে গ্রহণ যোগ্য।

বাংলা কবিতা মধ্য পর্বে ছিলো দেব দেবী বন্দনার বাহক। নানা ধরনের মঙ্গলকাব্য সে সময় রচিত হত। তথাপি সেই কাব্যধারায় মানুষের অভাবের জ্বালা লুকনো থাকেনি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেবীর কাছে ছিল দুঃখভরা রোদন। ফুল্লরা তার দুঃখের গানে বলেছেন—

'দুঃখ কার অবধান প্রভু দুঃখ কর অবধান
আমানি খাওয়ার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

এমন দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবন যে খাবারের থালাও কেনার সামর্থ্য নেই। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন—

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'

এসবই তাদের নিজস্ব মর্মবেদনার কথা। এর কিছু পর সাহিত্যে সর্বহারার বার্তা নিয়ে এলেন নজরুল। নজরুল নিজেও ছিলেন দারিদ্র্য পীড়িত। যে কারণে ঠিকমতো পড়াশোনার সুযোগও তিনি পাননি। বাধ্য হয়ে তিনি হাবিলদারের চাকরি নিয়েছিলেন। করাচিতে থাকার সময়ই তিনি মার্কসবাদের কথা, সর্বহারা শ্রেণির বার্তা পেয়েছিলেন। চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন কলকাতা মুজাফফর আহমেদের ডেরায়। একের পর এক কবিতা যেন জ্বলন্ত আগুন। ১৯শ শতকে এক কবি বলেছেন—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হেয়, কে পরিবে পায়। (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

ঊনিশ শতকের কবির এই বাণীই ছিল নজরুলের চিত্তভাষী।

বাংলা সাহিত্যের এইসব ধ্রুবতারাদের কাছে সুকান্ত একান্ত শিশু— অপ্রাপ্ত এক বালক— কিন্তু চোখে তার স্বপ্ন ডানা মেলে উড়ছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন খ্যাতিমান কবি, পদাতিকের কবি। তিনি একবার বলেছেন, 'সুকান্তর চোখের দিকে যে তাকাবে সেই বুঝবে এমন কিছু সে দেখতে পাচ্ছে যা আর কারো চোখে পড়ে না। আমরাও তাই সুকান্তকে সেইদিনই ভালোবেসে ফেললাম।'

কিশোর বাহিনীতে যুক্ত হয়ে সারা কলকাতা সে চষে বেড়ায়— নাওয়া নেই খাওয়া নেই, খালি পেটে কিশোরদের নিয়ে গান বাঁধেন, নাটক লেখেন। অসহায় নিরন্ন মানুষের সেবায় সে কিশোরদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

'আজন্ম দেখেছি আমি আশ্চর্য নতুন এক চোখে
আমার সোনার দেশ, আসমুদ্র ভারতবর্ষকে
আমার সমুখে ক্ষেতি, এ প্রান্তরে উদয়াস্ত খাটি
ভালবাসি ও দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি।'

কৈশোরের ডানা মেলা পাখি এক অনন্য কবি সুকান্ত। সে সময়কালের যাঁরা কবি তাদের কবিতা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল, মোহিতলালের হাত ধরে পৌঁছে গেছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্র দত্ত-র হাতে। কিন্তু এঁদের বাংলা কবিতা জটিল। এ কবিতায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিস্তারের মাত্রা অন্যরকম। এরা সকলেই যে প্রগতিশীলতায় পরিপূর্ণ ছিলেন এমন

নয়। এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রবিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন। কবি সুকান্তর সব থেকে বড় অবদান এই যে বাংলা কবিতাকে তিনি সমকালীন সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে সত্যিকারের মাটির সন্ধান দিয়েছেন। যার পরিচয় পাই আপাততুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাঁর যে কবিতা তাও বিস্তৃতিলাভ করে সমাজ মানসে। যেমন সিঁড়ি, কলম, সিগারেট, দেশলাই। তাঁর কবিতা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েও জনমানসে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। আধুনিকতার যন্ত্রণা, অসহায়তা এবং বিদ্রোহ সবই তাঁর কবিতাকে অনন্য করেছে। যেমন একটি মোরগের কাহিনী কিংবা রানার। বাংলা কবিতাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে অপরূপ ভাষাশৈলীতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। 'হে মহাজীবন' কবিতায় কবি বলছেন—

'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ লালিত—ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।'

শত দারিদ্র্যও তাঁর মগ্ন গভীর চেতনাকে হারাতে পারেনি। চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে একজন তাঁর কাছে ঠিকানা চেয়েছেন, তিনি লিখলেন—

জালিয়ানওলায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালাবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

কবির শেষ পরিণতি অবশ্যই অতি দুঃখের। অসময়ে খাওয়া বা না-খাওয়া, উদায়স্ত পার্টির কাজ, দুর্ভিক্ষের দিনে পি.আর.সি.-র হয়ে প্রতি দিনের কাজ, তাঁর দুর্বল শরীরকে আরো দুর্বল করেছে। নিদারুণ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন। মিত্ররা তাঁকে নিয়ে এলেন যাদবপুরের টি.বি. হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতাল তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। মাত্র একুশ বছরেই মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিয়েছে।

সুকান্ত আজও অমর হয়ে আছেন তাঁর কবিতার জন্য। তাঁর শিল্পকর্মে আছে স্বপ্ন দেখার আনন্দ, যা আজও অমলিন। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— এ সকল কবিতা অমর মানুষের রচনা, যে মানুষের বয়েস কোনোদিনই রূপকাহিনীর বয়েস ছাড়িয়ে বুড়ো হয় না।

এই অমল প্রতিবাদী কবির প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ - ২০২৪ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শৈবতীর্থের সর্বোচ্চ মন্দির তুঙ্গনাথে কিছুক্ষণ

সমীর কুমার ঘোষ

গাড়োয়াল হিমালয়ের পাঁচ শৈবতীর্থ তথা পঞ্চকেদারের অপার সৌন্দর্য মনে-প্রাণে অনুভব করার জন্য গত ২০ মে ১৯৭৯ তারিখে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে সর্বলোক-বিস্ময়কর কেদারের বিশাল উত্তুঙ্গ উজ্জ্বলতম চিরনীহারময় গিরিশৃঙ্গের সানুদেশে ভোলামহেশ্বরের জগৎবিখ্যাত মন্দিরে মহিষের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় শ্যামবর্ণের বিশাল শিলাসদৃশ ভগবান শ্রী কেদারনাথজীর দর্শন ও পুজো-পাঠ অন্তে শিবলিঙ্গের আলিঙ্গনের পর শ্রী মদমহেশ্বরের শান্ত, ধ্যানমগ্ন হিমালয়ের এক অনন্য প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করার পর আমরা দশ জনের একটি দল (আমার সহকর্মী আকাশবাণীর সেতার বাদক রবি সেন (স্টাফ আর্টিস্ট), শম্ভু বিশ্বাস, স্বপন মিত্র, দুলালী বিশ্বাস, কৃষ্ণা স্বরূপা, জয়া বিশ্বাস এছাড়া কুন্ডু স্পেশালের ট্যুর ম্যানেজার রবি কর্মকার, হেল্পার ক্ষুদিরাম ও একজন কুক) নেমে আসি ১ জুনে লেঁখ-মনসূনা-গিরিয়া হয়ে উখিমঠে বা উষামঠে দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ। গতকাল মদমহেশ্বর থেকে প্রায় ২০ কিমি উৎরাই পথে ট্রেক করে লেঁখে পৌঁছে রাত্রিযাপনের জন্য স্কুলবাড়িকেই বেছে নিই। আজ খুব ভোরে পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙ্গে। বিছানা ছেড়ে উঠতে শরীর চায় না কারণ, গতকাল টানা হাঁটায় আজ হাঁটু দুটো একটু বিশ্রাম চায়। তবুও উঠতে হয় শম্ভুদার তাড়ায়। বলেন শয্যাত্যাগ না করলে সব বাঁধা-ছাঁদা করে রওনা হতে দেরি হয়ে যাবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুখ শয্যা ত্যাগ করে চাদর, কম্বল ভাঁজ করে রাখি মালবাহকের জন্য। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম ঘুম চোখে চা নিয়ে হাজির। বলে দাদা এবার তৈরি হয়ে নিন, টিফিন প্রস্তুত হচ্ছে। ভোরের শিরশিরানি ঠাণ্ডার মধ্যে এক কাপ গরম আদা-চায়ে চুমুক দিতেই শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ছুটে বেড়িয়ে পড়ি সাইট সিলেকশানের জন্যে।

গরম গরম আলুপরোটা ছিল প্রাত:রাশে। তারপর বেডিং বাঁধা ছাঁদা করে মালবাহকের জিম্মায় দিয়ে বাবা তুঙ্গনাথের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিতে দিতে পথে নেমে পড়ি। সোয়া সাতটায় লেঁখ গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করলাম উখিমঠের উদ্দেশ্যে। লেঁখের স্কুলবাড়ির পিছন দিক থেকে একটা পাকদন্ডী পথ নেমে গেছে নদীর দিকে। নদীর উপর নতুন ঝোলা পুল পার হয়ে ওপারের পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে পথ চলে গেছে মনসূনা গ্রাম ছুঁয়ে গিরিয়া হয়ে উখিমঠে। নদীর কাছে এসে শুনতে পাই সুমধুর সুরধ্বনি। কলকল করে পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনা তুলে খিল খিল করে মধুর হাসি হেসে নদী বয়ে যায় আপন খেয়ালে। সারাক্ষণই বয়ে চলেছে। বিশ্রামের সময় কোথা। আমরা একটু নীচে নেমে সমধুর ঠাণ্ডা পবিত্র জল জ্যারিকেনে ভরে নিই। বেগবতী নদীর বিরামহীন বয়ে যাওয়া দেখি প্রাণভরে। ইতিমধ্যে একটা বিচিত্র বর্ণের পাখি ডানা মেলে মাথার উপর দিয়ে শিস্ দিতে দিতে উড়ে গিয়ে নদীপাড়ের ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পথ ভারী সুন্দর। রোদের তাপ এখনও এসে পৌঁছয়নি। পথ যদিও চড়াই তবে শরীরে কোন কষ্ট নেই এই চড়াই ভাঙতে। পথের ধারে নানারকম ছোটো বড় গাছ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কত যুগ ধরে। যেন এরা প্রতীক্ষারত ছিল আজ প্রাতে আমাদের সম্ভাষণ জানানোর জন্য। জঙ্গলময় পথ কিছুটা চড়াই পরে উৎরাই। তবে, চড়াই পথটাই যেন বেশি উৎরাইয়ের থেকে। এইভাবে প্রায় পৌনে দু ঘণ্টা হাঁটার পর পৌঁছলাম মনসূনায়। দেখছি রাস্তা চওড়া করার কাজ চলছে। হয়ত বছর খানেকের মধ্যে পাকা রাস্তা হয়ে যাবে। মোটর চলাচলের উপযুক্ত হয়ে উঠবে লেঁখ থেকে উখিমঠ পর্যন্ত। রাস্তা তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে। রাস্তা প্রস্তুত হয়ে গেলে যাত্রা সুগম হবে, সময় বাঁচবে অনেক। স্থানীয়দের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। হ্যাঁ, তবে হেঁটে পাহাড়ের জঙ্গলাকীর্ণ পথ চলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে তীর্থযাত্রীকে।

এপর্যন্ত এই কয়দিনে বার বার মনে হয়েছে হিমালয়ের এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে পায়ে হেঁটে পথ চলার যে আনন্দ তার কোনো তুলনাই হয় না অন্য কোনো উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছানর। এ পথের প্রতিটি বাঁকেই যেন লুকিয়ে আছে অজানা রহস্য। যদি কেউ প্রকৃতিকে সঠিক ভাবে উপভোগ করার মন নিয়ে পথে নামেন তবে, তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন বা জানতে পারবেন পথের গোপন রহস্যটা কি? তবে তা দেখা বা বোঝার মতো মানসিকতা থাকা চাই।

পথে পেলাম আরেকটা ছোট ঝুলা পুল, পার হয়ে কিছুটা চড়াই পথ অতিক্রম করে সকাল নটায় পৌঁছলাম মনসূনায়। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। ঘর বাড়ির পাশে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে চাষের ক্ষেত। ফসলে রঙ ধরেছে। সকালের নরম আলোয়, মৃদু বাতাসে তারা দোল খাচ্ছে, একে অপরের গায়ে নুয়ে পড়ছে। গ্রামের মহিলারা ফসল তুলতে ব্যস্ত। পুরুষেরা ভেড়া, ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ে চড়াতে। পশুদের গলায় বাঁধা ছোট ছোট ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজ শুনতে শুনতে পথ চলা। আগে পিছে রয়েছে ইয়া বড় ভালুক আকৃতির পাহাড়ী কুকুর। তার গলায় চওড়া বকলেসের মতো করে বাঁধা রয়েছে টিনের পাত। হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচানর জন্যে। পথের ধারে নজরে এল কয়েকটা দোকান। চা থেকে মনিহারী সামগ্রী সবই পাওয়া, আবার প্রয়োজনে আশ্রয় মেলে রাত্রিবাসের। চায়ের দোকানে একটু বসি। দোকানী ১৪/১৫ জন যাত্রী পেয়ে বেজায় খুশি। দ্বিগুণ উৎসাহে কড়া করে চা বানায়। আমরাও মৌজ করে পান করি।

এখানে দুজন স্থানীয় ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়, তারা থাকে গিরিয়াতে। মনসূয়া গ্রামের পানি চাকীতে গম ভাঙাতে নিয়ে এসেছে সেই কোন ভোরে। কাজ হয়ে গেছে এখন ফিরে যাবে নিজ গ্রামে। সহজ, সরল গ্রাম্য কিশোরের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভালো লাগে। ওদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনতে শুনতে পথে নেমে পড়ি। সঙ্গী, সাথীদের চা পর্ব তখনও চলছে। আমি এগোই গিরিয়ার পথ রেখা ধরে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট মামুলী চড়াই পথ পেরিয়ে দেখতে দেখতে পৌঁছে যাই গিরিয়ার চায়ের দোকানে। ছেলেদুটি আটার বস্তা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় গ্রামের পথে। আমি একা বসে থাকি দোকানির বেঞ্চে। অপেক্ষা করি সঙ্গী, সাথীদের জন্য। চায়ের অর্ডার দিই। চা পান করতে করতে দেখি দূরে সাথীরা আসছেন। ওরা এসে পৌঁছলে আর এক প্রস্থ চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়।

(ক্রমশঃ)

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মনে রেখে

অমল কর

যবন-কাফের অবতার-পয়গম্বর
মোল্লা-পুরুত পাদরি-ভিক্ষু
সবাই ধর্ম-মাতাল, অসহিষ্ণু
এরা দাঙ্গা দিয়ে নাঙ্গা করতেও জানে
এরা শয়তানের চেয়েও বীভৎস
অনন্ত নিরয়ের দুর্গন্ধে জারিত
জরাজীর্ণ ক্ষতবিক্ষত কুটিল সময়ে
সম্প্রীতির ধারক-বাহক তুমি সুকান্ত
অন্তরঙ্গ অজস্র দীপনশক্তি নিয়ে
তুমি ভুবনভাবনায় কল্যাণচিন্তক
দিনখাটা মানুষের তুমি উদ্দীপক
সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের তুমি বিভাব
সংগ্রামের সসম্ভ্রম বিজয়ে দাসত্বের
বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিকামী মানুষের
ঐকান্তিক জীবনের উচ্ছল প্রবাহ তুমি
দুঃসহ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্বৃত্তায়ন দুঃশাসনে
দুরন্ত দুর্জয় দুর্মদ দুর্দম ছিলে তুমি
জন্মেই দেখেছ ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি
দুর্মর প্রত্যাশা প্রার্থিত ফের একবার
আর-একবার নব ক্যলস্বরে এসো ফিরে
ধোঁয়াশাচ্ছন্ন তমসাঘেরা অন্ধকার চিত্তে
মানুষের জন্য সমাজের জন্য জীবনের জন্য।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in